গ্রাজুয়েশন

আতিক রহমান

মাথার উপরের কম্পেক্টাসে হাতব্যাগটা রেখে সিটে আরাম করে বসলাম। জানলার পাশের সিট। প্লেন ছাড়ার এখনো বেশ বাকী। কুয়ালালামপুর থেকে ঢাকাগামী প্লেন। জানালা দিয়ে পড়ন্ত বিকেলের সূর্যরশ্মি এসে প্লেনের ভিতরে পড়ে সোনালী আভার মনোরম একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দূরে মালয়েশিয়ার নামকরা পাম বৃক্ষের সারি সারি বাগান, আর তার পিছনে অস্তমান লাল সূর্য সারা দিনের ডিউটি সেরে একটু পড়েই বাড়ী ফিরে যাবার অপেক্ষায়। সিট-বেল্টটা টান করে বেঁধে মালয়েশিয়া স্ট্রেয়েইট টাইমসে চোখ বোলাতে চাইলাম, কিন্তু হল না। ক্ষুদ্র জানালাটা দিয়ে যতদূর দেখা যায় তাই অবলোকন করার চেষ্টা করছিলাম। প্লেনে জানালার পাশের সিটে বসার ছেলেমানুষি আবদার আমার সব সময়; মাঝে মাঝে পাই, আবার পাইও না। ঐ জানালা দিয়ে তেমন কিছু দেখা যায় না। প্লেন যখন মেঘের উপর দিয়ে চলে তখন শুধু নীচে পেঁজা তুলোর মত সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়। ঐ সাদা সাদা তুলোর মত মেঘ মনে করিয়ে দেয় আমার ছোট সময়ের কথা যখন বাবা বাসায় ধুনকর ডেকে লেপ বানাতেন। মনে হয় ঠিক তেমনি যেন বিধাতা'র ধুনকর তুলা ধুনা করে রেখেছেন, কখন সে পৃথিবীর জন্য লেপ বানাবেন। প্লেনে আমার পাশের সীটটি এখনও খালি। জানি না কে হবেন আজ আমার উড়ন্ত শকটের সহযাত্রী- স্বদেশী, ভিনদেশী, বপু না তনু। পছন্দ মত সহযাত্রী পেলে জার্নিটা যে মোটেও বোরিং লাগে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সহযাত্রী নিয়ে পুরানো একটা ভ্রমণ কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল।

তখন ভার্সিটিতে প্রথম দিকের ছাত্র। এগ্রোনমির জনপ্রিয় শিক্ষক দলিল স্যারের উপদেশ; "ছুটি পেলে শুধু বাড়ী দৌড়বে না, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাবে, দরকার হলে বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে যাবে, সেখানকার মাটির টেকচার [soil texture] টপোগ্রাফি [topography] ইত্যাদি দেখবে। কোন অঞ্চলের ক্রপিং প্যাটার্ন [cropping petern] কেমন লক্ষ্য করবে, জানবে; তাহলেই তোমাদের পুঁথিগত বিদ্যার সাথে বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে"। শিক্ষকের উপদেশ, আর যায় কোথায়। এমনিতে নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি।

আমি আর আমার ভার্সিটি জীবনের সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি মিলে ঠিক করলাম, এবারের ফাইনাল পরীক্ষার পর বন্ধে আমরা রাজশাহী যাব। ওখানে আমার স্কুল জীবনের এক বন্ধু রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ল'এ অনার্স পড়ে, থাকে এফ রহমান হলে। যেই কথা সেই কাজ। অগ্রহায়ণের এক সকালে আমরা দুই বন্ধু মিলে আসাদ গেট থেকে রাজশাহীর বাসে চাপলাম। ড্রাইভারের পিছনেই আমাদের সিট। যথারীতি যাত্রা শুরু হল। কিছুক্ষণ চলার পর বাস সাভারের কাছে এসে থামল। ওখানে আগে থেকেই টিকেট কেটে রাজশাহীর যাত্রী অপেক্ষায় ছিল। দেখলাম সাভার ক্যান্টনমেন্টের এক আর্মি অফিসারের জীপ থেকে এক ভদ্রমহিলা তার দুই মেয়ে নিয়ে নেমে আমাদের বাসে উঠে আসলেন। মা'এর চোখে চশমা, বেশ আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। মেয়েদের বয়স ছোটটি আট কি নয় আর বড়টি ষোড়শী হবে হয়ত। মা' মেয়ে যথারীতি বাসে সিট দখল করলো ঠিক আমাদের বাঁয়ে ড্রাইভারের দিকে

মুখ করে। মেয়ে দুটি দেখতে বেশ, বিশেষ করে বড়টি। বড় বড় টানা টানা চোখ। পড়নের পরিধেয় মেয়েটাকে দারুণ মানিয়েছিল। আমাদেরও তখন উঠতি বয়স। বুঝতেই পারছেন সেই বয়স। সারা পথ ছোট মেয়েটা আমাদের দিকে তাকায় আর মিট মিট করে হাসে, আর বড়টি ছোট বোনকে শাসনের সুরে দমক দিয়ে আবার সে নিজেই হেসে ফেলে। মা একবার তাকায় মেয়েদের দিকে, প্রোক্ষণেই চশমার ফাঁক দিয়ে বড় বড় চোখে দাঁত কটমট করে আমাদের দিয়ে তাকায়। আর আমরা দুই বন্ধু সাথে সাথে ফাটা বেলুনের মত চুপসে যাই। এমনই চলছিল সারা পথ। মেয়ে দুটোর লুকোচুরি মিষ্টি হাসি, আর আমরা ঘাড় ঘুরালেই মিলিটারি মা'য়ের সেই রক্তচক্ষুর কড়া চাহনি, যেন পৃথিবীর কারও কোন অধিকারই নেই তার মেয়েদের দিকে তাকানোর।

এভাবে কেটে গেল প্রায় সারাটা পথ। ফেরি পারাপারের সময় ড্রাইভার সিগারেটের ধোঁয়াটা বাতাসে মিলিয়ে দিয়ে ফোকলা দাঁত বের করে একটা গালভরা হাসি দিয়ে বলল--কি ভাই জার্নি কেমন হচ্ছে? ফেরি পারের পর বাস আবার ছাড়ল। আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। এর মধ্যে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেলো। খেয়ালই নেই। বাস এসে নাটোরে থামল। আর অমনি বলা নেই কওয়া নেই, হুড়মুড় করে সেই মা জননী তার দু'মেয়েকে নিয়ে বাস থেকে নেমে গেলেন। মনে হলে পুরো বাসটা যেন হঠাৎ কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। মনে হল পাখীর বাসার মত বড় বড় টানা টানা চোখ নিয়ে নাটোরের সেই "বনলতা সেন" যেন আমাদের বাসে একা ফেলে চলে গেলো। আজো সেই স্মৃতি মনে করে আমরা দুই বন্ধু প্রায়ই হাসাহাসি করি।

যা হোক অবশেষে রাজশাহী পৌঁছলাম এবং ওখানে কাটালাম প্রায় পনের বিশ দিন। রাজশাহী শহরের অলি গলি চষে বেড়িয়েছি, সেই নিউ মার্কেট, পদ্মার পাড়, ভার্সিটি ক্যাম্পাস; পাশে সাহেব বাজার, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরি, সুগার মিল আরও কত জায়গায় ঘুরেছি। রাজশাহীর মাটির টেকচার দেখার সুযোগ হয়নি, তবে মন্নুজান হল, রোকেয়া হলের আস পাশের টপোগ্রাফি খুব ভালভাবে দেখা হয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই স্থানীয় বন্ধুদের সাথে ঐ দিকটায় যাওয়া হত। সবচেয়ে ভাল লেগেছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস-এর শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা। আমার মনে হয় আমার দেখা 'স্বাধীনতার শহীদদের স্মৃতি' স্থানগুলোর মধ্যে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের "শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা" সবচেয়ে সুন্দর এবং সমৃদ্ধ।

এরকম আরও অনেক ঘোরাঘুরি করেছি ছাত্রজীবনে। ছুটি পেলেই অর্ধেক ছুটি এখানে ওখানে কাটিয়ে বাড়ী যেতাম ছুটির শেষের দিকে। এমনই এক বন্ধের পর বাড়ী গেলাম। মা খেতে দিলেন। কাল কাল কি একটা জিনিষ প্লেটে দিলেন, কিছুই অনুমান করতে পারছিলাম না, খাবারটা কি? মাকে জিগ্যেস করলাম, মা বললেন, খেয়ে দেখ তারপর বল। চেখে দেখলাম, মাংসের স্বাদ মনে হল, কিন্তু কিসের মাংস বুঝতে পারছিলাম না। মা বললেন, ওটা কোরবানি ঈদের মাংস, চুলোয় জ্বাল দিয়ে দিয়ে তোর জন্য রেখে দিয়েছি। তখনকার দিনে আজকের দিনের মত বাড়ী বাড়ী ফ্রিজ ছিল না, আমাদেরও ছিল না। মাসের পর মাস চুলোয় জ্বাল দিতে দিতে মাংসের চেহারা আর মাংসের মত ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন কিছু একটার ভর্তা। মা অপেক্ষায় ছিলেন ছেলে কখন বাড়ী আসবে। এরই নাম মা। আজ এসব কথা মনে করে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়, মনে হয় মাকে যে কত না জ্বালাতন করেছি সেই বয়সে।

ঘোরাঘুরি আমার সারাজীবনের সাধ। এই ঘোরাঘুরি করে নিজের ভিতরের প্রদীপটা জ্বালাবার চেষ্টা করেছি মাত্র, পেরেছি কিনা জানি না। বিভূতি ভূষণের পথের পাঁচালী'র ডায়লগ, "মানুষ যেন এক

জায়গায় থেকে থেকে গাছ হয়ে যায়"। কথাটা আসলেই সত্যি। গাছেরও জীবন আছে মানুষের মত। মানুষ আর গাছের মধ্যে পার্থক্য তো ঔ-খানেই যেখানে মানুষ তার ভিতরের প্রদীপটা জ্বালিয়ে এ মনুষ্য জনমকে সার্থক করতে পারে, গাছ তা পারে না। সেই ভিতরের প্রদীপটা জ্বালাতে চাই কৌতূহলী মন, সমাজের উঁচু নিচু ছোট বড় মানুষ সবার সাথে প্রাণ খুলে মেশা, মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে প্রাণ ভরে ভালবাসা; তা হলেই ভিতরের প্রদীপটা জ্বললে জ্বলতেও পারে। এই জীবন প্রদীপ জ্বালাতে ইউনিভার্সিটিতে যাবার প্রয়োজন হয় না। ইউনিভার্সিটি পাশ করা গোটা কতক ডিগ্রীধারী কতজনকে দেখেছি অকাল কুষ্মাণ্ড হয়ে সুট টাই পড়ে একটা পদ দখল করে বসে নিজের আখের গোছাচ্ছে। জীবন প্রদীপ তো দূরের কথা নুন্যতম মনুষ্যত্ব-বোধও ভিতরে শেকড় গাড়েনি। এদের উপমা আমার কাছে শুধু "ঘরে আলো জ্বলে ভিতরে মানুষ নেই"।

সেই ছাত্র জীবনে দেশের উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, পূর্ব থেকে পশ্চিম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল চষে বেরিয়েছি। সেই টেকনাফের বার্মা সীমান্তে রাখাইন মহিলাদের হাতে বানানো তামাক পাতার বিড়ি, মহেশখালীর বাঁকে বৌদ্ধ পূর্ণিমায় মেলায় সাঁওতাল মেয়েদের নাচ, সিলেটের তামা-বিলে ঝর্না থেকে পানি তুলে উপজাতীয় মেয়েদের ঘরে ফেরা, সুন্দরবনের বাওয়ালীদের নৌকায় বসে ওদের জীবনযাত্রা দেখা। তারপর গঞ্জের হাটে নদীর ধারে বেদের নৌকায় সন্ধ্যা-বাতি জ্বালাতে দেখেছি, প্রায় প্রতি শনিবারে রাতের পাঠ শেষ করে পাশের বাড়ির হিন্দু কাকা কাকী-মা'র বাড়ী গিয়ে রাত জেগে কীর্তন শুনেছি, আবার বাবার হাত ধরে প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজে সামিল হয়েছি। জীবন প্রদীপ জ্বালাতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি; মানুষের খুশিতে হাসতে, মানুষের ব্যথায় কাঁদতে শিখেছি।

কথায় আছে না ইচ্ছে থাকলে টাকা যোগায় গৌরিসেন। সেই ছাত্র জীবনে আমার ঘোরাঘুরির রসদও যুগিয়েছে ভুতের মামী গৌরিসেন। ভার্সিটি জীবনের পুরো চারটি বছর ফ্যাকাল্টি থেকে পেতাম একশ টাকা আর আলীগড় ইউনিভার্সিটি এসোসিয়েশনের বৃত্তির একশ টাকা। হলে থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ লাগতো মাসে ১১০ বা ১২০ টাকা। সুতরাং মাসে ২০০ টাকার বৃত্তি আর তার উপর বাড়ী থেকে পাঠান ভাতায় হলে থাকা খাওয়ার খরচ বাদ দিয়ে যা থাকতো তা দিয়ে ছাত্র জীবনেও আমার ঘোরাঘুরির সাধটা ভালভাবেই মিটাতে পেরেছিলাম। আর সেই সুবাদে প্রাণভরে নিজের দেশ, মাটি ও মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সে জন্য আমি ধন্য ও গর্বিত ।

যা হোক, যেমনটা বলছিলাম। ভ্রমণে ভাল সহযাত্রী পেলে যাত্রার গ্লানি অনেকাংশে লাঘব হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার বিমানের সহযাত্রী এসে গেলেন। ব্যাগ পেটরা মাথার উপরের খুপরিতে রেখে আমার পাশের সিটটি দখল করলেন। ভদ্রলোক স্বদেশী, বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড়, পড়নে সাফারি– বাঙালী'র বাবুগিরি পোশাক বিশেষ করে আমলাদের বেশি পছন্দ; ওতে অনেকগুলো পকেট থাকে তো, তাতে ওনাদের অনেক সুবিধে। ভদ্রলোকের মাথা ভরা টাক, চোখে ভারী লেন্সের চশমা। প্রথম আলাপ চারিতয় জানলাম, উনিও সিডনি থেকে এসেছেন। পথে মালয়েশিয়ায় ট্রানজিটে কাটালেন কিছুদিন। এখন ঢাকায় যাচ্ছেন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই গগন বিদারী আওয়াজ তুলে প্লেন ছাড়ল। আর আমি ও আমার সহযাত্রী আস্তে আস্তে আরও ঘনিষ্ঠ হলাম। বুঝা গেল ভদ্রলোক সদালাপী এবং খোলামেলা ধরণের মানুষ, আমি নিজেও তাই। খুশী হলাম যাত্রা পথে একজন ভাল সহযাত্রী পাওয়ার জন্য। ভদ্রলোক আমার পরিচয় নিলেন, কয় ছেলে মেয়ে, কে কি করে ইত্যাদি ইত্যাদি, সব ঠিক ঠিক বললাম। তারপর তার পালা।

ভদ্রলোক যা বললেন, তাতে জানলাম উনি পেশায় ব্যবসায়ী, তিন সন্তানের জনক, ছেলে মেয়েরা সবাই বড় হয়ে গেছে, ছেলেরা বিবাহিত, যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তিন ছেলে মেয়ে সবাই অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। উনি নিজেও সস্ত্রীক অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন নিয়েছেন সম্প্রতি। তবে বছরের অনেকটা সময় ঢাকায়ও থাকেন। ব্যবসায়ী কাজে তাকে বিভিন্ন দেশে যেতে হয় প্রচুর। বললেন এবার মালয়েশিয়া এসেছিলেন সস্ত্রীক, তিনি কূয়ালা-লামপূরে ছিলেন কিছু দিন, এখন ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন, তবে একা। অতি সংগত কারণে আমার মনে প্রশ্ন উদয় হল, তা হলে ভাবী কোথায়? হুট করে তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। চুপমেরে থাকলাম, দেখি উনি নিজেই কিছু বলেন কিনা। একটু পরেই ভদ্রলোক বললেন ওনার মিসেসের মন খারাপ, তাই ট্রানজিটে না থেকে একা একা ঢাকা চলে গেছেন। উনি যাচ্ছেন পিছু পিছু। আমি আর সামনে এগুবো সে সাহস পাচ্ছিলাম না।

ধরেই নিলাম দাম্পত্য কলহ; ওনার মিসেস হয়ত রাগ করে একাকী চলে গেছেন ওনাকে পিছনে ফেলে। দাম্পত্য কলহ - সেতো হতেই পারে। সাথে সাথে মনে পড়ে গেলো আমার এক বন্ধুর "কফি গ্রাইণ্ডার" ভাবীর গল্প। খুলেই বলি - কফি গ্রাইণ্ডারে যেমন একদিক দিয়ে ভাজা কফিবিন দিলে অন্য প্রান্তে দিয়ে তরল কফি বের হয়ে আসে, ঠিক তেমনি নাকি সেই ভাবী ভাইজানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে - তারপর কফি লাটে, মোকা বা এক্সপ্রেসো - তরল কফি আকারে যেমনটা ইচ্ছা স্বামী বেচারাকে উপভোগ করেন। গল্পের ভাবীটির বাস্তবে কোন অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না, তবে হাসির খোরাকের জন্য দারুণ। আমার কথা ভাবছেন? আমি যেন তার জর্দার কৌটা, যখন খুশী বের করবেন, বাকী সময়টা ব্যাগে পুড়ে রাখবেন। আচ্ছা বলুন তো এই জংলা মনটাকে এভাবে আবদ্ধ করে রাখাটা কি ঠিক।

এরই মধ্যে মালোয়ী বিমানবালা আমাদের বাদামের প্যাকেট আর ড্রীংকস দিয়ে গেল। আমরা বাদাম চিবুচ্ছী আর আলাপ করেছি। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন আমি সিডনিতে কি করি। বললাম চাকুরী। ভদ্রলোক না ছোড় বান্দা, কি চাকুরী- সরকারি, না বেসরকারি। বললাম সরকারি। তারপর কোন ডিপার্টমেন্ট। ডিপার্টমেন্ট বলার সাথে সাথে ভদ্রলোক যেভাবে শুরু করলেন; তাতে মনে হল আমি যেন তার ভিতরে পুঞ্জীভূত যত ক্ষোভ আর মনকষ্ট মিলিয়ে যে ভয়াবহ বাষ্প জমা হয়েছিলে সেই বোতলের ছিপি খুলে ফেললাম। উনি শুরু করলেন তিনি প্রায় একলক্ষ ডলার খরচ করে নিজের এবং তাঁর স্ত্রী'র জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে ভিসা নিয়েছেন। প্রথমত একটু ভড়কে গেলাম; বলে কি এই লোক, টাকা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা কিনেছেন, অসম্ভব; আমাদের দেশ হলে ভিন্ন কথা। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেলাম এবং বুঝতে পারলাম উনি কিসের কথা বলেছেন। ভদ্রলোক আসলে কন্ট্রিবিউটরই প্যারেন্ট ভিসা [contributory parent visa] নেয়ার কথা বলেছেন। একলক্ষ ডলার; সেতো টাকার হিসেবে অনেক টাকা। বললেন ছেলেমেয়েদের সাথে থাকার জন্য শুধু এ ভিসা তিনি নিয়েছেন। তা না হলে এই বয়সে তার এদেশে অভিবাসন নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন চরম অসুখী। যেমনটা ভেবেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনটা হয়নি। ওনার চাইতে উনার স্ত্রী আরও বেশী অসুখী। তার স্ত্রী মনকষ্ট নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন, আর আসবেন কিনা জানেন না। তারপর বলেই চললেন তার দুঃখের কথা।

ভদ্রলোক নিজে নিজে গড়ে উঠা মানুষ [self built person]। বললেন তার ব্যবসায়িক জীবনের উত্থান পতনের নানান ঘটনার কথা। বললেন কিভাবে ঢাকায় ছোট্ট একটি খুপরি টিনের ঘরে কন কনে শীতের দিনে বড় ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে বড় করেছেন সেই ইতিহাস। সে ঘরে রীতিমত হু হু করে বাতাস ঠুকত। তারপর ব্যবসায় সাফল্য এলো। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করলেন। এখন ভাল টাকাকড়ির মালিক। ঢাকায় বাড়ী, গাড়ী সব আছে। সস্ত্রীক একটা বাড়িতে থাকেন, কয়েকটা

ফ্লাট-বাসা ভাড়া দেন। ভদ্রলোকের তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে মেয়েটি সবার ছোট, অস্ট্রেলিয়ার একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বললেন, তার অতি আদরের মেয়েটিও যেন কেমন বদলে গেছে, সে হারিয়ে ফেলেছেন অতি আদরের মেয়েকে এদেশে এসে। মেয়ে বেশ রাত করে বাড়ী ফিরে, কোন কোন রাতে ফেরেও না, মাকেও তোয়াক্কা করে না। মা না খেয়ে বসে আছেন সারাদিন, মেয়ে কখন ঘরে আসবে একসাথে খাবে। মেয়ে ঘরে এসে নিজের রুমে ঢুকেই দরজা সেঁটে দেয়। মা খেতে ডাকলে বলে, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। মা পিড়াপিড়ি করে বললে মেয়ের রূঢ় আচরণ; 'আদিখ্যেতা করো নাতো, তুমি খেয়ে নাও'। এগুলো তো মামুলি বিষয়।

তারপর বললেন দু'ছেলেই বিবাহিত, বউ নিয়ে ঘর সংসার করছে। ভাল কোন চাকুরী আজও পায়নি, অথচ একগাদা লোণ নিয়ে বাড়ী কিনে বসে আছে। কিসব উল্টা পাল্টা কাজ করছে আর লোণ পরিশোধ করছে, কিচ্ছু বলে না বাবা মাকে। বউরাও কিছু বলে না, বাঁধাও দেয় না, রাত বীরাতে কাজ করে বাড়ী ফিরে। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা মায়ের আক্ষেপ এতগুলো পড়াশুনা করে কেন ওদের এমন জীবন বেছে নিতে হবে এদেশে এসে। তাহলে তো দেশেই ভাল ছিল। ভদ্রলোকের আপসোস, সে কি এত কষ্ট করে ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষিত করছেন তার নিজ চোখে তাদের এই জীবন দেখে যাবার জন্য। আমি বোঝাতে চাইলাম এদেশে শ্রমের কোন ভেদাভেদ নেই, সুতরাং তার এটা নিয়ে মন খারাপ না করাই শ্রেয়। বুঝতে কষ্ট হয়নি, উনি আমার প্রবোধ দেয়া কথার সাথে একমত নন। সত্যি কথা কি আমি নিজেও একমত না, আছে শ্রমের ব্যবধান এদেশেও আছে। অন্তর চক্ষু মেলে একটু কাছ থেকে দেখলেই বোঝা যায়।

তারপর বললেন ছেলেরা বাবা মায়ের সাথে প্রাণ খুলে দু'টো কথাও বলে না। ছেলের বউদের কথা বাদই থাক। সব কিছু যেন বড় অপাংতেয় মনে হয় তার কাছে আজকাল। প্রবাসে তো কেউ মুখ খোলে না। পাছে নিজের কথা একান ওকান দশকান হয়ে নিজের কানে ফিরে আসে। সাবধানী মানুষগুলো নিজ নিজ ব্যথায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকে সারাজীবন। ভদ্রলোক হয়ত আমাকে যাত্রা পথের অচেনা পথিক ভেবে তার ভিতরের জমে থাকা কষ্টের কথাগুলো অকাতরে বলে একটু হাল্কা হবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক যা যা বলছিলেন, আমি যেন হৃদয় দিয়ে তা অনুধাবন করতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি তার ব্যথাটা কোথায়, কেননা আমিও যে বাবা। আসলে কি জানেন আমরা যারা বাবা মা অভিবাসন নিয়ে ভিনদেশে এসে শেকড় গেড়েছি, সন্তানের জন্য কতই না কষ্ট করেছি বা করে যাচ্ছি, শুধু ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং তাদের সুখের জন্য নিজেদের সকল ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিচ্ছি, দিয়েছি। বড় হয়ে সেই ছেলেমেয়েরা বাবা মা'কে কতটুকুই বা মনে রাখে। এইতো সেদিন এক বাঙ্গালী বাবা বললেন, প্রতি উইক এন্ডে তিনি তার অতি আদরের ছেলেকে নিয়ে সুদূর ক্যাম্বেলটাউন [Campbeltown] থেকে স্ট্রাথফিল্ডে [Strathfiled] আসেন ছেলের প্রাইভেট টিউটরিংইয়ের জন্য। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সারাদিন বসে থাকেন ছেলের ক্লাস কখন শেষ হবে। বললেন ছেলেকে টিউটরের কাছে রেখে বাড়ী ফিরে যান না, কেননা ছেলে ছোট মানুষ আর পেট্রোলের যা চড়া দাম। তাই শহরের এখানে ওখানে পার্কে ঘুরে সময় কাটান, তারপর দিনের শেষে ছেলের ক্লাস শেষ হলে ছেলেকে নিয়ে বাড়ী যান।

মানুষের জীবনকে অতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার এদেশেও এসেও হয়েছে। কত বাবা মা'য়ের চোখের জল দেখেছি, কত সুখ দুঃখের কথা শুনেছি এদেশে কাজের ফাঁকে। এইতো

সেইদিন এক ভিয়েতনামী মা অঝোরে কেঁদে গেলেন। সে জানেই না তার অতি আদরের মেয়েটি এখন এদেশে না প্রবাসে চলে গেছে। তার মেয়ে এক মাদক কারবারি [drug mule] ছেলের সাথে ভাব করে হয়ত ভিয়েতনাম চলে গেছে তার ধারনা। বাবা-মা জানে ঐ ছেলের আদ্যোপান্ত। কিন্তু ছেলের বি এম ডবলু [BMW] গাড়ী আর দেদার হাত খোলা স্বভাব দেখে মেয়ে পটেছে। মেয়ে এখন আঠার বছরের উপরে, বাবা-মা'র কোন এখতিয়ার নেই কিছু বলার।

ক' সপ্তাহ আগে ফিজিয়ান এক বাবা শত্তুরের কাছাকাছি যার বয়স, দুঃখের সাথে ছল ছল চোখে বলে গেলেন কিভাবে তার ছেলে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। ঠিক একই কায়দায় এক বাঙ্গালী বাবা বলে গেলেন তার দুঃখের কথা মাত্র ক'দিন আগে। ভদ্রলোক বাংলাদেশে উচ্চ পদে চাকুরী করতেন। অবসর নিয়ে একমাত্রর ছেলের কাছে থাকার জন্য এদেশে এসেছেন। তিনি আমাদের দপ্তরে এসেছিলেন তার অস্থায়ী ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য, মেয়ের কাছে যাবেন। মেয়ে ইস্ট ইউরোপের কোন একটি দেশে স্বামী সংসার নিয়ে থাকে। তার আবাসিক ঠিকানা আপডেট করতে গিয়ে জানলাম এখানে একমাত্র ছেলের সংসারে বাবার ঠাঁই হয়নি। বাবা এখন তার এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে অভিবাসনের কাগজে বন্ধুর আবাসিক ঠিকানাকেই তার প্রধান আবাসিক ঠিকানা হিসেবে লিপিবদ্ধ করে গেলেন।

এরকম হাজারো বাবা মা এদেশে অভিবাসন নিয়ে এসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে কোন কাজ করে সন্তান মানুষ করেন। বড় হয়ে সেই ছেলেমেয়েরা যার যার জীবন আর গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান ড্রিম [great Australian dream] নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশ করলেই ভাল চাকুরী মিলে যায়। নূতন গাড়ী নূতন বাড়ী আর মাথার উপর বিশাল ঋণের বোঝা নিয়ে জীবন উপভোগ করে। স্বামী স্ত্রী দু'জেন মিলে চাকুরী করে ঋণ পরিশোধ তার উপর বিলের চাপে নাভিশ্বাস উঠে । বাবা মা'র প্রতি নজর দেবার সময়ও আর তাদের থাকে না। সন্তানের কাছে টাকা পয়সা বা প্রাপ্তির কোন চাহিদা নেই অন্তত এদেশের বাবা মা'দের, কেননা এদেশে সরকারী ভাতা [social safety net] আছে। বাবা-মা'র থাকা খাওয়া বা চিকিৎসার জন্য সন্তানের চিন্তা করতে হয় না। শুধু সন্তানের একটু ভালবাসা, একটু শ্রদ্ধাবোধই বোধহয় যথেষ্ট। সেটুকু না পেলে বড় কষ্ট হয়।

তাইতো প্রয়াসই ভাবি কত বাবা মা যে এদেশে এ সমাজে মৃত মন নিয়ে বেঁচে আছেন তার হিসেব কে রাখে। কথায় আছে না; দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রি হয়, জীবিতের আদম শুমারি হয়, কিন্তু মনের মৃত্যুর এসব কিছুই হয় না। তাই ইদানীং লেবানিজ কবি খলিল জিব্রানের "Children" কবিতার ক'টা লাইন মনের ঠিক গভীরে বড্ড বেশী রিন রিন করে বাজে;

> Your children are not your children.
> They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
> They come through you but not from you,
> And though they are with you yet they belong not to you.

[শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ দলিল উদ্দিনসহ যত দীক্ষাগুরু যাঁদের দীক্ষায় আর প্রেরণায় আজ এই আমি জীবনের এই প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে, তাদের সবার জন্য আমার এ লেখা উৎসর্গীকৃত।]